কোন দিকের রচনা

অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, উদ্ভট আতিশয্য বা চরম হাস্যজনক পরিস্থিতি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয় ফার্স বা প্রহসন। তবে আলোচ্য নাটকের কায়াগঠন কিন্তু তেমন ভাবে হয়নি, বরং স্বাভাবিক যুক্তিসঙ্গত ঘটনা সন্নিবেশই 'একেই কি বলে সভ্যতায়' বেশি লক্ষিত হয়। ইয়ং বেঙ্গল শ্রেণির প্রতিনিধি নবকুমার তার বৈশ্ববভক্ত পিতার কলকাতা-আগমনে স্বাধীনভাবে ফুর্তি করার ব্যাপারে একটু অসুবিধায় পড়েছিল। কিন্তু বন্ধু কালীনাথ কোনো মতে বন্ধুর পিতাকে তাদের জ্ঞান তরঙ্গিনী সভার উচ্চ জাতীয়তাবাদী আদর্শের কথা বলে অনুমতি আদায় করল এবং বারবনিতা পল্লিতে গিয়ে পানাহার, নৃত্যগীত ও বারবনিতার সঙ্গে যথেষ্ট ফুর্তি করল। এরপর রাত্রে পানোন্মত্ত অবস্থায় নবকুমার পিতৃগৃহে ফিরে পিতা-মাতা স্ত্রী ভগ্নীদের সামনেই বেলেল্লাপনা করতে লাগল। নবকুমারের আদর্শপরায়ণ চরিত্র ও তথাকথিত আদর্শবান জ্ঞান তরঙ্গিনী সভার স্বরূপ সেই রাত্রেই উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। এই ঘটনা তৎকালীন কলকাতার সামাজিক জীবনে অসম্ভব অবাস্তব উদ্ভট কিছুই নয়।

মূলত কলকাতায় অপেক্ষাকৃত বিত্তবান শিক্ষিত পরিবারের তরুণ যুবকবৃন্দ এমনি করেই তখন কলেজী বিদ্যা আহরণ করে সমাজ সংস্কারের বুলি কপচে তারই আড়ালে অবাধ মধ্যপান ও বারবনিতা নিয়ে চরম ফুর্তির মধ্যে দিন কাটাত । মনে রাখতে হবে, নাট্যকার শহর কলকাতার ফুর্তিবাজ ফুলবাবু সমাজের ছবি আঁকেননি। যাঁরা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত তাঁদের ভণ্ডামিকেই তিনি উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। 'ইন দি নেম অফ ফ্রিডম লেট আস এনজয় আওয়ার সেলিভস' এই উক্তির প্রচারকদের স্বরূপ উন্মোচন করাতেই তাঁর প্রহসনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়।

এই তথাকথিত শিক্ষিত বা শিক্ষাভিমানী ভণ্ডদের আচরণগত অসংগতির কিছু লঘু অথচ বস্তুনিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছিলেন নাট্যকার তির্যক ভঙ্গিতে–তাই এটি সিরিয়াস নাটক নয়। রূপ নিয়েছে প্রহসনের। নবকুমার সম্প্রদায়ের এই পরিণতি দুঃখজনক, কিন্তু তাকে আপাত পরিহাসের লঘুতায় দেখানো হয়েছে বলেই নাট্যকার একে ফার্স বলতে চেয়েছিলেন। এটি মিলনান্তও নয়, সুতরাং কমেডিও বলা যাবে না। আবার এটি কোনো মহৎ বিষয়ের বিদ্রুপাত্মক অনুকরণও নয়। তাই একে বার্লেস্কও বলা যায় না। এর চরিত্রগুলি অল্পবিস্তর কমিক— সিচুয়েশানও সামান্য পরিমাণে কমিক্যাল। আধুনিক কালের সুররিয়ালিষ্ট ফ্যানটাসি ধর্মী ফার্সের সঙ্গেও এর সম্পর্ক নেই।

ফার্সের অন্যতম ধর্ম হল নিষ্করুণতা, 'একেই কি বলে সভ্যতায়' মধুসূদনের ভূমিকাও বস্তুত নিষ্করুণ। অসঙ্গতিকেই তিনি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, তাই তীব্র সহানুভূতির রসে তাঁর চরিত্রগুলি দ্রবীভূত হয়নি। ফরাসি ফার্স রচয়িতাদের মতো সমাজ সচেতনতাই মধুসূদনের বিশিষ্টতা, তিনি এখানে প্রখরভাবে সমাজ সচেতন বলেই ফার্সের নামকরণ থেকে শুরু করে বিষয়বস্তু, সর্বত্র একটা দেশকালের সীমার মধ্যে জাতীয় জীবনের একটি

বিকৃত রুচি ও জীবনধারাকেই শ্লেষে ফোটাতে চেয়েছিলেন। অনাবিল পরিহাসের সঙ্গে তাই এখানে bitterness ও অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়ে গেছে।

কৌতুকময়তার পরিভাষাই হল প্রহসন। ব্যঙ্গ বিদ্রুপের ঘনীভূত উদ্দেশ্য হলেও প্রহসনে আগাগোড়াই একটি লঘু পরিহাসের আবরণ থাকে। 'একেই কি বলে সভ্যতার সংলাপে মধুসূদনের সেই কৌতুকপরায়ণতার উদাহরণ ছড়ানো রয়েছে। এই প্রহসনে ইংরাজি শিক্ষিত নব্যযুবকদের ইংরাজি বাংলা মেশানো বিকৃত সংলাপে মধুসূদনের পরিহাসিক চিত্ত ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ, তাদের মুখে রয়েছে শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর বিন্দাদূতীর গীতি। শিকদার পাড়ার গলিতে কায়াবিলাসিনীদের রঙ্গরস, পুলিশের চৌকিদার দারোগার শিকার ধরার দৃশ্য। নোটেনের খানসামা বেয়ারাদের নেপথ্য আক্ষেপ, জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার সদস্যদের বক্তৃতা, নবকুমারের গৃহে অন্তঃপুরিকাদের তাসখেলার দৃশ্য, সর্বত্র মধুসূদন কৌতুকহাস্যের উপকরণ সন্ধান করেছেন। এই লঘু পরিহাসের আয়োজনেই 'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রহসন স্বভাব অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

প্রহসন সাধারণত আয়তনের দিক থেকে খুবই সংক্ষিপ্ত, অপরিসর হয় এবং এতে ঘটনার কোনো জটিলতা থাকে না। প্রহসনের প্লট হয় সরল। 'একেই কি বলে সভ্যতা' মাত্র চার দৃশ্যের প্রহসন এবং একটিমাত্র দিনের ঘটনা। তার মধ্যে দিয়েই নাট্যকার সরলভাবে কাহিনি বিবৃত করেছেন।

সাধারণত ট্র্যাজেডি বা কমেডি নাটকে নাট্যচরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতের যে সুযোগ থাকে প্রহসনের চরিত্রে তার একান্ত অভাব দেখা যায়। প্রহসনে চরিত্রগুলিও তাই জটিল নয়। মধুসূদনও কোথাও কোনো চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেননি। বৈষ্ণব ভক্ত কর্তামশায় থেকে শুরু করে তার অনুগত বাবাজি, নবকুমার বন্ধু কালীনাথ, জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, নবকুমারের জননী ও ভগ্নীগণ, পুলিশের প্রতিনিধি বৃন্দ, বারবিলাসিনীর দল সকলেই মাত্র অল্পক্ষণের জন্য প্রহসনে দেখা দিয়েছে—তাঁদের চরিত্রের কোনো গভীর অদৃশ্য গোপন দিকের ওপর নাট্যকার আলো ফেলেননি। কেবল বাইরের দিক থেকেই তাদের স্বরূপগুলি তুলে ধরেছেন। এসকল কারণেই বোধ করি 'একেই কি বলে সভ্যতা' যথার্থ প্রহসন হয়ে উঠেছে।

নামকরণের সার্থকতা

মধুসূদন তাঁর সৃষ্টি কর্মের নামকরণের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ের প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছেন তাহল চরিত্র এবং ঘটনা। তিনি যে দুটি প্রহসন লিখেছিলেন সেদুটির মধ্যে একটিতে প্রধান চরিত্রকে 'বুড়ো শালিক' বলে উল্লেখ করে নাম দিয়েছেন—'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং অন্যটিতে তৎকালীন যুগের একশ্রেণির উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের লাম্পট্য, বেশ্যাসক্ত ও নানা কেচ্ছা কাহিনির বর্ণনা করে নাম দিয়েছেন—'একেই কি বলে

Brist

সভ্যতা? বিষয়বস্তু বা বক্তব্যের দিক দিয়ে ভিন্ন হলেও নামকরণের ক্ষেত্রে উভয় প্রহসনের একটা মিল আছে। দুটি প্রহসনের সমাপ্তিতে নামরকণের ব্যাখ্যার পদ্ধতি একই ধরনের। যেমন— 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এই প্রহসনের শেষ দুটি পঙ্‌ক্তি হল—

"শিক্ষা দিলে কিলে চোটে, হাড় গুঁড়িয়ে যোয়ের মোয়া,

যেমন কর্ম ফলসো ধর্ম, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।।"

অন্যদিকে "একেই কি বলে সভ্যতা"র শেষ দুটি বাক্য হল— "মদ মাস মেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয় ?–একেই কি বলে সভ্যতা?" এই শেষ উক্তিটির সাহায্যেই প্রহসনটির নামকরণ করা হয়েছে। উক্তিটি শুধু নবকুমারের দুর্ভাগিনী স্ত্রী হরকামিনীর নয়—এ যেন নাট্যকারের জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা। আধুনিক সভ্যতা যে বিকৃত সভ্যতা তা বোঝাবার জন্যই নাট্যকার সুকৌশলে এই জিজ্ঞাসা চিহ্নের ব্যবহার করেছেন।

'জ্ঞানতরঙ্গিনী' সভায় গিয়ে নবকুমারের এবং তার বন্ধুরা আকণ্ঠ মদ্যপান করেছে, গোমাংস ভক্ষণ করেছে এবং বারাঙ্গনা নিয়ে নাচ গান ও ফুর্তি করেছে। এসবই তারা করেছে আধুনিক সভ্যতার নামে। এদের না ছিল কোনো উচ্চ আদর্শ, না ছিল জ্ঞান স্পৃহা, না ছিল উচ্চ ধরনের প্রতিভা। সমাজ সংস্কারের নাম করে তারা অবাধে চালিয়েছে স্বেচ্ছাচার লাম্পট্য ও মদ্যপান। ইংরাজি সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকে উদ্ভাসিত 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের অক্ষম অনুকারী এরা। এরা ছিল স্বল্প শিক্ষিত আদর্শহীন, এবং ভোগাবিলাসে মত্ত। ধনীপিতার সন্তান হিসাবে এদের হাতে ছিল অঢেল অর্থ এবং সেই অর্থ তারা ব্যয় করেছে অসংযত জীবনাচরণে। মদ ও মাংস ভক্ষণকেই তারা জীবনের পরমার্থ বলে মনে করত এবং বেশ্যা গমনকে আধুনিক সভ্যতার অঙ্গ বলে বিশ্বাস করত। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'সেকাল ও একাল' গ্রন্থে বলেছেন "যেমন পান দোষ বৃদ্ধি পাইতেছে তেমনি বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা কিন্তু সভ্যতার চিত্র।" রাজনারায়ণ যে সভ্যতার কথা বলেছেন তা বিকৃত সভ্যতা। কারণ পান দোষ ও বেশ্যাগমন কখনই প্রকৃত সভ্যতার চিহ্ন হতে পারে না।

নবকুমার ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও বেলেল্লাপনাকে অন্দরমহলেও টেনে এনেছে। মাতাল নবকুমার একদিন নিজের বোনকে সাহেবদের অনুকরণে চুম্বন করেছে। বৈঠকখানা ঘরে বন্ধু কালীনাথকে মদ খেতে দিয়েছে। নাটকের শেষে দেখা গেছে মদের নেশায় চুর হয়ে সকলের সামনেই 'মদ ল্যাও' বলে চিৎকার করেছে এবং নিজ স্ত্রীকে 'পয়োধরী' বলে সম্বোধন করেছে। নবকুমারদের এই কীর্তি দেখে তার বোন নৃত্যকালী রেগে গিয়ে বলেছে— "ও মা ছি। ইংরেজি পড়লে লোক এত বেহায়া হয় গো"। ইংরেজি শিখলেই কেউ মাতাল হয় না বা অধঃপাতে যায় না। কিন্তু নৃত্যকালী ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত দুশ্চরিত্র মাতাল নবকুমারের চরিত্রকেই চোখের সামনে দেখেছে তাই তার মনে হয়েছে ইংরেজি শিক্ষাই তার দাদাকে অধঃপতনের শেষ ধাপে নামিয়েছে।

এই শ্রেণির চরিত্র তাদের দাম্পত্য জীবনকে কীভাবে কলুষিত ও ধ্বংস করেছে তা হরকামিনীর একটি উক্তিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অসহায় নারী জীবন যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে চলেছে—"এইসব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি দিয়ে মরি"। তার শেষতম উক্তি—"মদমাংস খেয়ে ঢলাঢলি করলেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা"? তাঁর এই সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ, উচ্চকিত উক্তি উদ্যত তীক্ষ্ণধার বর্শাফলকের মতো যেন এই ভয়াবহ বিকৃত সভ্যতাকে বিদ্ধ করতে চাইছে। এইখানেই 'একেই কি বলে সভ্যতা'র নামকরণের সার্থকতা নিহিত।

প্রহসনে সমাজচরিত্রে হাস্যরস

প্রহসন মাত্রেই হাস্যরসাত্মক, আর হাসির সঙ্গে থাকে নাট্যকারের সমাজচেতনা— তাই সে হাসি একটু উদ্দেশ্যমূলক ও ক্ষুরধার হয়ে দেখা দেয়। 'একেই কি বলে সভ্যতায় মধুসূদনের হাস্যরস সৃষ্টি উদ্দেশ্যমূলক হলেও এতে অনাবিল পরিচ্ছন্ন কৌতুক হাস্যের উপাদানও যথেষ্ট। আসলে সাধারণ লঘু কৌতুক নাট্য এবং প্রহসন দুয়েরই লক্ষ্য থাকে একটি দিকেই বক্তব্য বিষয়ের অসংগতিকে তুলে ধরা। স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে উৎকেন্দ্রিক অসংগতিই কৌতুকহাস্যের উপাদান। আলোচ্য নাট্যকে সে লক্ষণ দুর্লক্ষ্য নয়।

একদা মধুসূদনের দুটি প্রহসন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শশাঙ্কমোহন সেন মন্তব্য করেছেন—"এই দুটি প্রহসন মধুসূদন যেন একটা দুমুখো করাত হাতে লইয়াই যুগপৎ বিলাতি সভ্যতার বাঁদরামীকে এবং দেশীয় হিন্দুস্থানির ভণ্ডামিকে সরলভাবে কাটিয়েছেন। বিদেশি সভ্যতার বর্জ্য পদার্থগুলিকে গ্রহণ করে নবকুমার ও কাশীনাথ যে ভণ্ডামি ও বাঁদরামির পরিচয় দিয়েছে তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের আঘাতে যেভাবে ছিন্নভিন্ন করেছেন নাট্যকার তাতে তাঁর Satire ধর্মী মনোভাবটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নাটকের প্রথম দৃশ্যেই কালীনাথ যেভাবে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ও জয়দেবের গীত গোবিন্দকে 'শ্রীমতী ভাগবতীর গীতি' এবং 'বোপদেবের বিন্দা দূতী' বলে উল্লেখ করেছে তাতে পাঠকের পক্ষে হাস্য সংবরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। নবুকমারের সঙ্গে কথোপকথন কালে যখন সে বলে যে—"সোনাগাছিতে আমার শত শাশুড়ীর আলয়" তখন একটু নিম্নস্তরের হলেও একটা হাস্যরস সৃষ্টি করে। নিজে ভণ্ড হয়েও যখন যে বৈষ্ণব বাবাজিকে 'হিপক্রিট' বলে কিংবা নিজে নীতিহীন হয়েও সিকদার পাড়ায় বাবাজিকে দেখে ভীত নবকুমারকে যখন সে বলে 'তোমার... মরাল কারেজ নেই'—তখন পাঠকের হৃদয়ে কৌতুক রসের ছটা ছড়িয়ে পড়ে।

সিকদার পাড়া স্ট্রিটে দুই বারাঙ্গনা যেভাবে বাবাজিকে নাস্তানাবুদ করেছে কিংবা পথচারী জনৈক মাতাল গেরুয়াবসনধারী বাবাজিকে দেখে বলেছে—"ওগো এখানে কোথায় যাত্রা

Brist

হয়েছে গো"—তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই দর্শকচিত্তে কৌতুকরস উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। লোভী উৎকোচ গ্রহণে পটু ও নারীসঙ্গলিপ্সু বাবাজির চরিত্রটি যেন হাস্যরসের খনি। গেরুয়া বসন, কপালে তিলক, হাতে জপমালা, মুখে সর্বদাই 'রাধা কৃষ্ণ' ভেকধারী এই বৈষ্ণব যখন দুই সুন্দরী বারাঙ্গনাকে দেখে সতৃষ্ণ নয়নে তাকায় তখন বাবাজির আসল স্বরূপটি দেখে দর্শকেরা কৌতুক অনুভব করে। চৌকিদার ও সার্জেন্টের হাতে ধরা পড়ে এবং তাদের হাতে ঠ্যাঙানি খেয়ে সে যখন কাকুতি মিনতি করে—'আমি যাচ্ছি বাবা, আর মারিসনে বাবা, দোহাই বাবা, তোর পায়ে পড়ি বাবা, তখন বাবাজির হেনস্থা দেখে দর্শক উচ্চহাসিতে ফেটে পড়ে। অন্যদিকে সার্জেন্ট যখন থলির ভেতর থেকে জপমালা বের করে নিজের গলায় পরে রসিকতা করে— তখন সেই রসিকতাও দর্শকদের মনে হাস্যরসের উদ্রেক করে।

নবকুমার যেভাবে ইংরেজি বাংলা মিশ্রিত খিচুড়ি ভাষা ব্যবহার করেছে এবং যেভাবে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় উনবিংশ শতাব্দীর মহৎ মানুষদের ব্যর্থ অনুকরণ করে বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছে তা দর্শকদের মনে কৌতুক জাগায়। বাড়িতে ফিরে এসে মদের ঘোরে নিজ স্ত্রীকে সম্বোধন করে যখন সে বলে—"এ কী পয়োধরী যে? আরে এসো এসো, এ অভাজনকে কি ভাই তুমি এত ভালেবাস, যে এরজন্য ক্লেশ স্বীকার করে এত রাত্রে এই নিকুঞ্জ বনে এসেছো"— বিকারগ্রস্ত নবকুমারের এই প্রেমালাপ শুনে দর্শক উচ্চহাসিতে ফেটে পড়ে।

নাটকের অন্তিম দৃশ্যের একেবারে শেষ অংশে ভূলুণ্ঠিত নেশাগ্রস্ত নবকুমারকে দেখে পিতা ক্রোধান্বিত হয়ে যখন বলেন—"কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করব। এ লক্ষ্মীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল এখন আমরা যাই। এ বানরটা একটু ঘুমুক।" তখন মদ্যপ নবকুমার নিজের অজ্ঞাতেই বলে ওঠে— "হিয়ার হিয়ার আই সেকেন্ড দি রেজোলুসন।" এ কৌতুক হাস্য উচ্চাঙ্গের। পিতা তাকে 'বানর' বলে সম্বোধন করছে, আর মাতাল নবকুমার নেশার ঘোরে তাকে সম্বোধন করছে—হাস্যরসের এ দৃষ্টান্ত সাহিত্যে বড়ো বিরল।

সর্বোপরি, মধুসুদন আগাগোড়া এইভাবে তাঁর মনের সঞ্চিত বেদনা প্রকাশ করেছেন "একেই কি বলে সভ্যতা"য়। উৎকৃষ্ট humour-এর লক্ষণ এটাই। নবকুমার কালীনাথ, বাবাজি চরিত্রের অসঙ্গতি ও নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে বটে, কিন্তু কোথাও কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও ঈর্ষার জ্বালা প্রকাশ পায়নি। মাঝে মাঝে কিছু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ থাকলেও মূলত প্রহসনটি যে প্রথম শ্রেণির humour তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

Bristi

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের প্রধান চরিত্র নবকুমার উনিশ শতকের বাংলার নব্য-শিক্ষিত, বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল যুবসমাজের প্রতিনিধি। সে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে মদ্যপান ও নৈতিক অবক্ষয়ে লিপ্ত, কিন্তু তার এই আচরণ "সভ্যতা" নয়, বরং সামাজিক ব্যাধি, তা নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন [১, ৪]।

নবকুমার চরিত্রের প্রধান দিকগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

- **অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা:** পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নবকুমার মনে করে, মদ্যপান ও অসংযত জীবনযাপনই সভ্যতার লক্ষণ। সে তার বন্ধুদের সাথে নিয়ে আড্ডায় মত্ত থাকে এবং নিজস্ব সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করে [১, ৩]।

- **উচ্ছৃঙ্খল ও বিবেকহীন:** নবকুমার নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বেসামাল কথাবার্তা বলে এবং তার চারপাশের মানুষের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। কালীনাথের মতো বন্ধুদের নিয়ে সে প্রমোদ ভ্রমণে লিপ্ত থাকে [৪, ৬]।

- **কপটতা:** প্রহসনের এক পর্যায়ে, নিজের অপকর্ম ঢাকার জন্য সে লোক দেখানো ভণ্ডামির আশ্রয় নেয়। সে কালীনাথকে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের রূপ ধারণ করতে বলে, যাতে সমাজ তাকে সভ্য মানুষ বলে গণ্য করে [৪]।

- **সামাজিক অবক্ষয়:** নবকুমারের চরিত্রটি সমাজের সেই অংশের প্রতীক, যারা ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার ভুল অর্থ বুঝে নিজেদের নৈতিকতা ও পারিবারিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে [৫, ৬]।

সব মিলিয়ে, নবকুমার কোনো ইতিবাচক চরিত্র নয়, বরং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিকৃত অনুকরণে মগ্ন এক যুবকের চিত্র। তার আচরণে সমাজ জীবনের যে কদর্য রূপ ফুটে ওঠে, তার মাধ্যমেই মধুসূদন দত্ত "সভ্যতা" সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক প্রশ্ন তুলেছেন।

প্রহসন ঘটনাপ্রধান বলে চরিত্রের কোনো বিবর্তনরেখা অঙ্কিত হয় না। এখানে ঘটনাই প্রধান এবং চরিত্রগুলি টাইপধর্মী। 'একেই কি বলে সভ্যতা?'র প্রধান চরিত্র নবকুমার, তাকে কেন্দ্র করেই প্রহসনের কাহিনী আবর্তিত এবং পরিণতিও তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই তৎকালীন নব্যবঙ্গ সমাজের অন্যতম প্রতিনিধি। এ প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে নরনারী' গ্রন্থে বলেছেন— "একেই কি বলে সভ্যতার নায়ক নববাবু একটা শ্রেণীরূপের প্রতিনিধি। এমনকি নববাবু যে-কোনো ব্যক্তির নাম নয়, ইংরাজি-পড়া নতুন নববাবুর দল বা ইয়ংবেঙ্গল, তাহা তৎকালীন লোকেরাও বুঝিয়াছিলেন।"

অবশ্য সমালোচকের উক্ত বক্তব্য সমগ্রত সমর্থনীয় নয়। নবকুমার কলেজে পড়া তরুণ নবযুবক; সে পাশ্চাত্য ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত। সে অন্যান্য অনেকের মত হিন্দুসমাজের নানা কুসংস্কার থেকে মুক্তি পেতে চায়। সে তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চায়। সে পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে চায় না; সামাজিক সংস্কারই তার একমাত্র কাম্য। তারই

জন্য সে গড়ে তুলেছে 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'। নবকুমার মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার দেখতে চেয়েছে এবং বিধবা-বিবাহ আন্দোলনও তার পরিচিত। মধুসূদন- সমকালীন বাংলাদেশে যে প্রগতিশীল সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলন নবকুমারের বিদ্যোৎসাহিতা ও সমাজসংস্কার আন্দোলন তার দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু প্রহসনে নবকুমারের ভূমিকা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সে ভোগবিলাসী, স্ফূর্তিতে নিমজ্জিত, বারাঙ্গনাসঙ্গ কামনায় উৎসুক এবং মদ্যপায়ী। সে ইন্দ্রিয়সুখে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবার জন্য সে পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে চায়। তার কাছে পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থ মদ্যপান, বারবিলাসিনী গমন, খেমটা নাচ উপভোগ ও নিষিদ্ধ খাদ্যভক্ষণ। তার এবং তার সঙ্গীসাথীদের ভাষা বিশুদ্ধ বাংলা বা ইংরেজি নয়; জগাখিচুড়ি। তাদের কেউই স্বদেশি ঐতিহ্য সংস্কৃতির ধার ধারে না। তারা জীবন উপভোগ বলতে বোঝে স্বেচ্ছাচার। নবকুমার এবং তার সঙ্গীরা প্রমত্ত ভোগবাসনাকে মহত্ত্ব প্রদানের জন্য 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা করেছে যার অন্তরালে আসলে নানা কুকর্ম চলে; আর এই কুকর্মের অর্থ যোগায় স্বয়ং নবকুমার।

জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'য় যে অনুষ্ঠান হয় সিকদার পাড়ার গলিতে সেখানে নবকুমার পিতৃঅর্জিত টাকা প্রদান করে। সেখানে শুধুই বারবিলাসিনীদের নৃত্যগীত, মদ্যপান, খেমটা নাচ উপভোগ ইত্যাদি। তারপর রাত্রে মাতাল হয়ে ফিরে এসে নবকুমার ইংরাজি কায়দায় ভগ্নীকে চুম্বন করে। পিতার সম্মুখেই সে ব্র্যাণ্ডির জন্য চাকরকে বলে; পিতার বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য করে। নবকুমারের পিতা ভক্ত বৈষ্ণব বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাগমন করায় সে বেশ অসুবিধায় পড়েছে। সে পিতাকে সমীহ করে, ভয় করে, প্রকাশ্যে তাকে উপেক্ষা করার সাহস তার নেই। বাইরে বেরনো তার মুস্কিল হয়ে পড়ে। পিতা তাকে সন্দেহ করে তার সহচর বৈষ্ণববাবাজীকে তাদের 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'র খোঁজে পাঠান। পিতার অসাক্ষাতে সে বন্ধুকে মদ খাওয়ায়, পান খাইয়ে মদের গন্ধ ঢাকতে বলে। সে পিতার দুর্বলতা কোথায় জানে। তাই শ্রীমদ্ভাগবদগীতা বা জয়দেবের নাম উল্লেখ করতে শিখিয়ে দেয়। কালীনাথ যখন বৈষ্ণবাবাজীকে কাটলেট চপ ইত্যাদি খাওয়াবার কথা বলে তখন সে বুদ্ধি ও চাতুর্যের দ্বারা উৎকোচ দিয়ে বাবাজীর মুখ বন্ধ করতে চায়।

নবকুমার 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার' মধ্যমণি; তার বন্ধুরা তার সমালোচনা করলেও নেতৃত্ব স্বীকার করে নেয়। সে বাসর্বস্ব ভোগবাদী চরিত্রহীন যুবক হলেও তার নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা আছে। 'নবকুমারের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বুদ্ধির প্রাচুর্য ও বাস্তবতাবোধের পরিচয় মেলে পিতৃপ্রেরিত চর বৈষ্ণবগোঁসাইয়ের হাতে ধরা পড়ার পর। নবকুমার চরিত্রের দুটি পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে সে ভদ্র, বিনয়ী, পিতৃভক্ত, সদ্বংশজাত সন্তানের মতই তার আচরণ। মদ্যপানকে সে ঘৃণিত কাজ বলে মনে করে না, কিন্তু গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত। আবার দ্বিতীয় পর্যায়ে 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা' থেকে ফেরার পর সে অসংযত, বাচাল, অপরিণামদর্শী ও বাস্তবতা বোধহীন চরিত্র।' পিতৃশিক্ষা তার জীবনে কার্যকরী হয়নি বলে পিতা তাকে 'কুলাঙ্গার' বলেছেন। নবকুমারের মধ্য দিয়ে ইংরাজি শিক্ষার অসারতাও প্রমাণিত হয়েছে। একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে নবকুমার চরিত্র এক অসংগতির

নামাবলী। "আধুনিক নগরজীবী সভ্যতার এই অন্তঃসারশূন্যতা ও বৈপরীত্যই নবচরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন। নবকুমারের চরিত্রে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, সংকট নেই – নব একদিকে ব্যক্তিচরিত্র, অন্যদিকে শ্রেণীর প্রতিনিধি।"

নবকুমার চরিত্রের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অশোককুমার মিশ্র তাঁর 'বাংলা প্রহসনের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন–

(১) "নবকুমার কেবলমাত্র ইয়ংবেঙ্গলের শ্রেণী প্রতিনিধি নয়, তার মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ স্পষ্ট।"

(২) "ইয়ংবেঙ্গলদের ব্যঙ্গ করা নয়, অত্যাধিক মদ্যপানের বিরোধিতা করাই নাট্যকারের অভিপ্রেত ছিল। সে কারণেই নাটকের মধ্যে বার বার মদ্যপানের কথা আছে। 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা' দৃশ্যে বারাঙ্গনা উপস্থিত থাকলেও মদ্যপানের চিত্রই সেখানে গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কর্তামশায় নবকুমারকে নির্লজ্জ বলে ধিক্কার দিলে সে বলেছে, 'ড্যাম লজ্জা, মদ ল্যাও।' এবং নাটকের পরিসমাপ্তিতে বিষাদের করুণ সুর যখন উচ্ছ্বসিত, হাস্যতরঙ্গের অভ্যন্তরে ফল্গুস্রোতে বহমান তখন নবর স্ত্রী বলেছে, 'মদ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়"?

কোনো কোনো সমালোচক নবকুমার চরিত্রের মধ্যে মধুসূদনের আত্মপ্রতিফলন লক্ষ্য করেছেন। যেমন ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর 'নাট্যকার মধুসূদন' গ্রন্থে বলেছেন—"নবকুমার চরিত্রের মধ্যে স্বয়ং কবির আত্মপ্রতিফলন ঘটেছে এরূপ মনে করা অযৌক্তিক নয়। নবকুমারের চরিত্রের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মধুসূদনের সাদৃশ্য আছে। নবকুমারের বেশ্যাসক্তি মধুসূদনের নেই। আর মধুসূদনের প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি থেকে নবকুমার একেবারে বঞ্চিত। তবে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার নেতৃত্বপদ লাভ করার মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে নবকুমার সাধারণের কিছু ঊর্ধ্বে। যদিও মধুসূদনের ন্যায় অত্যুচ্চ প্রতিভার সঙ্গে তার তুলনাই চলে না। নবকুমারের চরিত্রে শ্রেণি স্বভাব যতটা প্রকট, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ততটা নয়। শ্রেণির পরিচয়ে মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের সমগ্রতা ধরা অসম্ভব। তবুও নবকুমারের মধ্য দিয়ে যে ধরনের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক জীবনাদর্শের প্রতি তিরস্কার বাণী উদ্যত করেছেন কবি, তিনি নিজে ছিলেন তার এক প্রধান প্রতিনিধি। নবকুমারের মাধ্যমে তার আত্মতিরস্করণ ঘটেছে।"

কালীনাথ

কালীনাথ নবকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আলোচ্য প্রহসনে ঘটনা সংঘটনে তার ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যে কালীনাথ একদা নবকুমারের সহপাঠী ছিল সেই কালীনাথ বর্তমানে নবকুমারের দৈনন্দিন জীবনের আমোদ-ফূর্তির সাথী। সে নিজে যথেষ্ট বিত্তবান পরিবারের সন্তান নয় বলে, আমোদপ্রমোদের জন্য অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় বলে সে নবকুমারের

Bristi

সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছে। শুধু তাই নয়, নবকুমারের সান্নিধ্য তার অত্যন্ত প্রয়োজন। নবকুমারের পিতার আগমনে 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার' অবলুপ্তি ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিলে সে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। নবকে সভায় নিয়ে যাবার জন্য নানা প্রকার মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। তার জীবনের মূল লক্ষ্য আত্মসুখচরিতার্থ করা।

আলোচ্য প্রহসনে কালীনাথ নবকুমারের মত গুরুত্ব না পেলেও নবকুমারের পরই তার স্থান। অন্যান্য চরিত্রের অপেক্ষা আলোচ্য প্রহসনে কালীনাথের গুরুত্ব অনেক বেশি। কালীনাথ আসলে নবকুমারের পরিপূরক এবং সেও নব্যবঙ্গীয় সমাজের বিকৃতির প্রতিনিধি। ইয়ংবেঙ্গলের চরিত্র লক্ষণ তার চরিত্রে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সমালোচক মনে করেন, "ত্রিশের দশকের ডিরোজিও পন্থী কালাপাহাড়ী মেজাজের ইয়ংবেঙ্গল না হলেও কালীনাথের মধ্যে সেই সময়কার স্বশ্রেণীভুক্ত গোষ্ঠীর চারিত্র্য লক্ষণ অনেকটাই মিলে যায়। সেদিক থেকে বলা যায় নবকুমারের চেয়ে কালীনাথই তার গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরূপে গোষ্ঠীর স্বরূপ উপস্থাপনে অধিক ভূমিকা গ্রহণ করেছে।" কালীনাথ সুরা আর নারী জাতকেই একমাত্র সত্য মনে করে। তার রসিকতা অত্যন্ত নির্লজ্জ ধরনের। নবকুমারের পিতার কাছে কীভাবে আত্মপরিচয় দেবে এ প্রসঙ্গে রসিকতা করে বলে, বিয়ার নামক পানীয় বংশে তার জন্ম; যদিও অন্যান্য অকুলীন পানীয়ের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে। শহরের অভিজাত সোনাগাছিতে তার নিত্য যাতায়াত। বিদেশি হোটেলের নিষিদ্ধ খাদ্যে তার তৃপ্তি। সে বারাঙ্গনাদের পানালাপে ও রঙ্গরসিকতায় অভ্যস্ত। মাঝে মাঝে তার গলা শুকিয়ে যায় বলে বন্ধুর বাড়ি পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতিতে দুর্বলতাবোধ করে এবং স্থান-কাল-পাত্র ভুলে যতটা পারে গলধঃকরণ করে। সে বলে, পান খাওয়া নয়, পান করাই তার বিলাস।

সে কলেজে পড়লেও তার বিদ্যাবুদ্ধি বেশ স্থূল। তার রুচি বিশৃঙ্খল জীবনাচরণে এবং তার মেজাজ বেশ নিম্নগামী। তার সংলাপগুলি তার বিকৃত জীবনরুচির পরিচয় বহন করে। 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার' কেউ কেউ তাকে পড়াশুনা জানা লোক মনে করে; আবার কেউ কেউ তার লেখাপড়া জানায় সন্দেহ প্রকাশ করে। সে জীবনে 'শ্রীমদ্ভাগবত' ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র নাম শোনেনি। তার স্মরণশক্তিও বেশ দীন। আবার সে বেশ বিশুদ্ধ বাংলায় বলে, 'এই সভাটি সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্য সংস্থাপনা করেছি।' সে মিথ্যাভাষণেও বেশ পটু; কেননা জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার কার্যকলাপ যে সংস্কৃতচর্চা এবং সেখানে সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক কেনারাম বাচস্পতি মহাশয় অধ্যাপনা করেন এমন মিথ্যাকথা অম্লানবদনে জানিয়ে যায়।

কালীনাথ অবশ্য স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ নয়; আর এইখানেই নবর সঙ্গে তার পার্থক্য। বৈষ্ণববাবাজীকে দেখে নবকুমার ভীতিগ্রস্ত হলে কালীনাথ তাকে চপ-কাটলেট খাইয়ে বশীভূত করতে চায়। এমনকি সে নবকুমারকে বলে যে, তার কোনো 'মরাল ক্যারেজ' নেই। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কালীনাথ চরিত্রের আন্তঃঅসঙ্গতি ধরা পড়ে। নবকুমার বৈষ্ণববাবাজীকে উৎকোচে বশীভূত করলে সে বলেছে— "এদিকে মালা ঠকঠক

Brist

করে আবার ঘুষ খেয়ে মিথ্যা কথা কইতে স্বীকার পেলো? শালা কি হিপক্রীট!" বৈষ্ণববাবাজীর আচরণের বৈপরীত্যে কালীনাথ তাকে হিপক্রীট' বলেছে অথচ সে নবকুমারের পিতার সামনে দ্বিধাহীনভাবে মিথ্যা কথা বলেছে। কালীনাথ এমনই তথাকথিত ইয়ংবেঙ্গল – সে সংস্কারকামী, স্বাধীনতাকামী যুবসমাজের প্রতিনিধি। প্রহসনে সে পার্শ্বনায়ক।

মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'র অন্যান্য সদস্যদের নাম ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। মধুসূদন মাত্র কয়েকটি সংলাপ ও নাট্য অভিব্যক্তির সাহায্যে তাদের আংশিক রূপ তুলে ধরেছেন। অবশ্য তা খণ্ড হলেও সামাজিক প্রতিনিধিরূপে তারা অনেকখানি পূর্ণ। আলোচ্য প্রহসনের 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার সদস্যরা সকলেই প্রায় নবকুমার ও কালীনাথের মত। তারা ভোগাকাঙ্ক্ষী, লম্পট, মদ্যপ, বারবিলাসিনীদের সঙ্গ লোভাতুরা, ইংরাজি-বাংলা মিশ্রিত বুলিতে কথা বলে। তাদের আচরণও বেশ হাস্যকর; মদে-মাংসে তারা ডুবে থাকতে ভালোবাসে আর বঙ্গনটীদের সঙ্গসুখ চায়। পাশ্চাত্যপ্রথায় সভা পরিচালনায় এরা বেশ দক্ষ। উৎসাহসূচক সমর্থনের জন্য বলে, 'ব্রাভো,' 'থ্রি চিয়ার্স', 'হিপ হিপ হুর রে' ইত্যাদি। চেয়ারম্যানের স্বাস্থ্যপান করে নৃত্য-গীত উপভোগের পর এরা টেবিলে খেতে বসে। সাহেবিয়ানার রীতিগুলি এরা বেশ আয়ত্ত করেছে।

প্রহসনে কালীনাথের চরিত্র বিস্তৃত হলেও, 'জ্ঞানতরঙ্গিনী' সভার অন্যান্য সদস্যদের চরিত্র যথেষ্ট স্বল্পায়তন। নাট্যকার কয়েকটি আঁচড়ের সাহায্যে তৎকালীন যুগ পরিবেশের পটভূমিকায় চৈতন, বলাই, শিবু, মহেশ প্রমুখ সভ্যের চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। তারা সকলেই পাশ্চাত্য বিদ্যা-শিক্ষা, রীতি-নীতির সুফল আয়ত্ত না করে কুফল আয়ত্ত করেছে। যেমন— ইন্দ্রিয়বৃত্তির ও ভোগলালসার চরিতার্থতা, মদ্যাসক্তি, অপরকে অবজ্ঞা করা, আপন সভ্যতা-ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা ইত্যাদি।

আপনাপন ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই এরা যেন 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'র সভ্য হয়েছে। দোলাচল চিত্তবৃত্তির অধিকারী হলেও নবকুমারের নেতৃত্বে চৈতন আস্থাশীল। শিবু, কালী ও নবকুমারের বিদ্যাশিক্ষার উপর সে শ্রদ্ধাশীল। অথচ নবর আসতে দেরি হওয়াতে নবকে বাদ দিয়ে চৈতনকে সভাপতি করে সভার কাজ শুরু হয়েছে। নবকুমার তাদের দেরী হওয়ার কারণ জানিয়েছে; অথচ কিছুক্ষণ আগে নবকুমারের সমর্থক শিবু প্রমত্তভাবে নবকে বলে, 'দ্যাটস্ এ লাই'। বলাই ও মহেশ চরিত্রটিও নবকুমারের প্রতি ঈর্ষাকাতর। ইংরেজের অনুকরণে সভা পরিচালনা করলেও বারবিলাসিনীদের নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদই সেখানে মুখ্য। নবকুমারের বক্তৃতায় সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়। 'একেই কি বলে সভ্যতা? প্রহসনে সমাজচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার সদস্যরা

Bristi

ইয়ংবেঙ্গলের চিত্রকেই এখানে ফুটিয়ে তুলেছে। প্রত্যেকটি চরিত্র যুগ ও সমাজের চিত্রকে স্পষ্ট করলেও আপনাপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিতেও তারা যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছে।

কর্তামশাই

মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে নবকুমারের পিতা কর্তামহাশয় রূপে অভিহিত। তাঁর কোনো নাম দেওয়া হয়নি; চরিত্রটি স্বল্প রেখায় অঙ্কিত, কিন্তু চরিত্রগত পূর্ণতা অনুপস্থিত নয়। কর্তামশাইয়ের চরিত্রবৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে অশোককুমার মিশ্র তাঁর 'বাংলা প্রহসনের ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—"নবকুমারের পিতা কর্তামশায়ের চরিত্র ঘোর প্রাচ্যপন্থী চরিত্রদের প্রতিনিধিত্ব করছে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত একদল মানুষ অন্ধভাবে বিদেশিয়ানার অনুসরণ করতে শুরু করলে ধর্মসভার পৃষ্ঠপোষকতাধন্য গোঁড়া হিন্দুসমাজ অন্ধ প্রাচ্যপন্থী মনোভাব প্রদর্শন করতে থাকে। কর্তামশায়ের চরিত্রে প্রকাশিত হয়েছে সমাজের সেই অংশের চিত্র। পরম বৈষ্ণব কর্তামশায় অধিকাংশ সময় বৃন্দাবনে বাস করেন। স্বাভাবিক কারণেই বৈষ্ণবশাস্ত্রের সম্পর্কে তাঁর ভাবালুতার প্রকাশ ঘটেছে।"

প্রহসনটি থেকে জানা যায়, কর্তামশায় বৃন্দাবনে বাস করেন, কখনো কখনো কলকাতায় এলে আপন বাসভবনে বাস করেন। নাটকের আরম্ভে কর্তামশায় কলকাতায় এলে নবকুমার অসুবিধায় পড়েন এবং তেমনই এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে নাট্যঘটনার সূত্রপাত। কলকাতা সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তিনি কলকাতাকে 'বিষম ঠাঁই' বলে মনে করেন। তাঁর কাছে কলকাতা হল পাপ ও দুর্নীতির সহাবস্থানের কেন্দ্রভূমি। তাই কলকাতা এলে নবকে চোখের আড়াল করেন না; তিনি অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং নবকুমার সম্পর্কে তাঁর ধারণা অসত্য প্রমাণিত হয়নি। পুত্রের সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও তিনি পুত্রের অধঃপতন রোধ করতে পারেননি। পুত্রকে তিনি মনে করেছেন 'কুলাঙ্গার' এবং আত্মগ্লানিতে জর্জরিত হয়ে পুনরায় বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

যথার্থ বৈষ্ণব কর্তামশাই-এর চরিত্রে কোনো অসঙ্গতি নেই এবং প্রহসনটিতে মধুসূদন তাঁকে কোনো ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেননি। কর্তামশাই-এর চরিত্র ভাবাকুলতা ও বাস্তবতা উভয়ের সংমিশ্রণে গঠিত। তিনি দর্শকদের হৃদয়াসনে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। কলকাতার অন্যান্য বৈষ্ণবভাবাপন্ন মানুষজন তাঁর অজানা নয়। বৈষ্ণবজনদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি অসীম। নবকুমারের বন্ধু কালীনাথের জনৈক খুল্লতাত বাঁশবেড়ের কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ পরম বৈষ্ণব ছিলেন, বৃন্দাবনেই তার প্রয়াণ ঘটে। কালীনাথের মুখে তাঁর নাম শুনে তিনি জানিয়েছেন যে তিনি তার পরম মিত্র ছিলেন। কালীনাথের মুখে 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'র আদর্শ ও কার্যাবলীর কথা শুনে তিনি গর্বিত হয়েছেন। তবে কর্তামশাই বেশ দুর্বলহৃদয়বিশিষ্ট; কেননা কালীনাথ নবকুমারের পরামর্শে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে তাঁকে অনায়াসে জয় করে ফেলে। 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায়' শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ও গীতগোবিন্দের চর্চা হয় শুনে তিনি ভক্তিনত চিত্তে বলেন, "আহা কবিকুলতিলক, ভক্তিরস সাগর।"

কালীনাথের বাক্যজালে প্রভাবিত হয়ে নবকে 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় যেতে দিলেও সংশয়ী কর্তামশাই তাঁর সন্দেহ দূরীকরণের জন্য তাঁর সঙ্গী বৈষ্ণব বাবাজীকে 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'র খোঁজে প্রেরণ করেন। এইখানেই তাঁর বাস্তববুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'র ঠিকানা, কার্যবিবরণ; কার্যকলাপ, আলোচনা ইত্যাদি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। অবশ্য বৈষ্ণববাবাজীর কাছ থেকে সমস্ত তথ্যাদি না পেলেও তিনি পানোন্মত্ত নবকুমারের গৃহে প্রত্যাবর্তন ও তার আচার-আচরণ দেখে বেশ ক্ষুব্ধ হন। তিনি পুত্রকে 'কুলাঙ্গার, দুরাচার এবং নরাধম' রূপে অভিহিত করে বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তনের সংকল্প ঘোষণা করেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে আবেগপ্রবণ মনে হলেও তিনি বাস্তবানুগ সিদ্ধান্তে অচল। তাঁর ভাষারীতি ও সংলাপও তাঁর চরিত্রের পরিচয় দেয়। তাঁর ভাষারীতি কৃত্রিম বা আড়ষ্ট নয়। কর্তামশায়ের মুখে প্রযুক্ত ভাষারূপ মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন। সজ্জন, ধর্মভীরু, রাশভারি কর্তামশাই-এর মুখের ভাষা তাঁর চরিত্রেরই প্রতিফলন।

নারী চরিত্র

মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে নারীচরিত্রের সংখ্যা বেশি নয়। নবকুমারের মাতা (প্রহসনে যার কোনো নাম নেই, গৃহিণী বলা হয়েছে), নবকুমারের স্ত্রী হরকামিনী, বোন প্রসন্নময়ী, খুড়তুতো বোন নৃত্যকালী এবং তাস খেলার সঙ্গিনী কমলা। তবে প্রহসনটিতে গৃহিণী এবং হরকামিনী ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয়।

গৃহিণী :

প্রহসনটিতে নবকুমারের মাতা রক্তমাংসে গঠিত সজীব চরিত্র। তিনি স্বাভাবিক, স্নেহশীলা গৃহিণী ও জননীরূপে নাটকে অঙ্কিতা। তাঁর চরিত্রে অসঙ্গতি নেই বললেই চলে, তবে পুত্র-স্নেহাধিক্য প্রবল। তিনি কর্তার সঙ্গে বৃন্দাবনে থাকেন না কলকাতায় থাকেন নাটকে সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। তিনি প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল নারী। তাঁর পুত্রবধূ ও কন্যাদের আলস্য ও গল্পগুজব তিনি সহ্য করতে পারেন না। বউমা ও কন্যাদের তিনি 'কলিকালের মেয়ে' বলে খোঁটা দেন। সংসারে সমস্ত কিছুর প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি অথচ নবকুমারের প্রতি তাঁর কোনো শাসন নেই পুত্রস্নেহের আধিক্যে। তাঁর স্নেহান্ধতাই যে নবকুমারের পতনের অন্যতম কারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি পুত্রের অপকর্মে বিশ্বাস করেন না। 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'র নামও তাঁর জানা নেই; তিনি বলেন 'রামমোহন রায়ের সভা'। পুত্রের গতিবিধি সম্পর্কে তিনি কোনো খোঁজখবর রাখেন না।

প্রহসনের শেষ দৃশ্যে নবকুমার নেশার ঝোঁকে উদ্ভট আচরণ করলে স্নেহময়ী মাতার উদ্বেগাকুলতা প্রবল হয়ে ওঠে। পুত্রের মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরুলেও তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না। তিনি ভাবেন, তাঁর 'দুধের বাছাকে কেউ বিষ খাইয়েছে। কর্তামশায় নবকে তিরস্কার করলে তিনি 'সোনার নবকে' বকার জন্য বেদনা অনুভব করেছেন।

কর্তামশায় যখন বলেন যে, নব মদ্যপান করেছে তখন গৃহিণী বাৎসল্যভরে বলেন- 'আমার এ দুধের বাছাকে কে এসব শেখালে গো?' নেশার ঘোরে নবকুমার ইংরেজি বুলি বললে তার মা মনে করেছেন, নবকে ভূতে পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত পুত্রের অবস্থা উপলব্ধি করে তিনি কর্তার সঙ্গে বৃন্দাবনে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রহসনটির 'গৃহিণী চরিত্রে একদিকে যেমন তার পুত্র স্নেহাধিক্য দেখিয়ে নবর পতনের পথকে দেখানো হয়েছে অন্যদিকে তাঁর এই সমস্ত শিশুসুলভ উক্তি যথেষ্ট হাস্যরসের যোগান দিয়েছে।'

হরকামিনী :

নবকুমারের স্ত্রী হরকামিনী বাস্তবধর্মী স্বাভাবিক চরিত্র, নাট্যকার তার চরিত্রে অতিরঞ্জন বা বিকৃতির প্রশ্রয় দেননি। হরকামিনী নবকুমারের স্ত্রী হলেও সে যেন প্রাচীন অন্তঃপুরিকা নারী। প্রহসনের শেষ দৃশ্যে অর্থাৎ দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে অন্যান্য নারী চরিত্রের সঙ্গে হরকামিনীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দৃশ্যে হরকামিনী রাত্রিবেলায় তার ননদদের সঙ্গে তাস খেলছিল। শহরের ধনী মেয়েদের মতো সে আলস্যে, ক্রীড়াকৌতুকে, রঙ্গ রসিকতায়, তাসখেলায় দিনাতিপাত করে। নবর মা অর্থাৎ হরকামিনীর শাশুড়ি বৌমা ও মেয়েদের এই খেলাধুলা অপছন্দ করেন; তিনি রুষ্ট হন। শাশুড়ির গলা শুনে হরকামিনী তাসগুলি বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখে। হরকামিনী জানে না যে তার স্বামী জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় গেছে; গৃহিণীর কাছ থেকে জানতে পারে। অর্থাৎ নবকুমারের সঙ্গে তার হৃদয়ের বন্ধন খুব বেশি ছিল না। হরকামিনীর সঙ্গে প্রসন্নকুমারীর রঙ্গরসিকতা তার অসংস্কৃত মনের প্র হরকামিনীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে অশোককুমার মিশ্র তাঁর 'বাংলা প্রহসনের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন—'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে নারী চরিত্রগুলির ভূমিকা কেবলমাত্র দুঃখ সহনে এবং নিদারুণ অন্তর্ব্যথায় সুদীর্ঘশ্বাস হাহাকারে। আপাতচটুল পশ্চাৎপট ব্যবহার করে মধুসূদন নবকুমারের অন্তঃপুরের যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা উনিশ শতকের স্বচ্ছল হিন্দুর পারিবারিক চিত্রকে উপস্থাপিত করেছে। ইংরাজি আদবকায়দায় অভ্যস্ত, সভ্যতাভিমানী নবকুমারের স্ত্রী হরকামিনী এই প্রহসনের সবচেয়ে দুঃখী চরিত্র। উগ্র আধুনিক আদবকায়দায় অভ্যস্ত স্বামীর প্রায় অশিক্ষিতা অন্তঃপুরচারিণী বাঙালি কুলবধূ সে। স্বামীর সঙ্গে তার মিলনের অবকাশ ঘটেনি, কারণ স্বামী জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা থেকে যখন ফেরে— তখন সে প্রথমত, স্বাভাবিক থাকে না। দ্বিতীয়ত, স্ত্রীর সবচেয়ে লজ্জা স্বামী বারাঙ্গনা বিলাসে অভ্যস্ত হয়ে এসে তাকেও বারবিলাসিনীর মতই সম্বোধন করে। তৃতীয়ত, মদ ও পেঁয়াজের দুর্গন্ধে হরকামিনী ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে। স্বামীর দৈনন্দিন অপকর্মের জন্যে দুঃখে তার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। এই দুঃখী অনুভবটুকু ছাড়া পরচর্চা, তাসখেলা এবং আদিরসাত্মক রসিকতার মধ্য দিয়েই ননদদের সঙ্গে সে দিন কাটায় আর পাঁচ জনের মত।